

তৃতীয় অধ্যায় পাকিস্তান : রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও বৈষম্য

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হয়। এই নতুন রাষ্ট্র তার জন্মলগ্ন থেকেই অসংখ্য সমস্যার সম্মুখীন হয়। ব্রিটিশ আমলে ভারতের মুসলমানেরা হিন্দুদের চেয়ে শিক্ষাদীক্ষা, প্রশাসনিক দক্ষতা, ব্যবসাবাণিজ্য প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা দক্ষ ছিলেন তাঁরাও ভারতের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। ভারত উত্তরাধিকার সূত্রে কেন্দ্রীয় রাজধানীর সকল সুযোগ সুবিধা এবং সারাদেশ জুড়ে বিস্তৃত একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল প্রশাসনিক কাঠামো লাভ করে। অপরপক্ষে পাকিস্তানকে নতুন করে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে হয়, কেন্দ্রীয় সচিবালয় স্থাপন করতে হয় এবং নতুনভাবে প্রশাসনিক অবকাঠামো গড়ে তুলতে হয়। এমতাবস্থায় ভারত থেকে অনেক মূল্যবান ফাইলপত্র না-পাওয়ায়, এবং অনেক নথিপত্র ভারত থেকে আনয়নকালে দাস্তাকারীদের হাতে বিনষ্ট হওয়ায় প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেয়। ভারত থেকে বিপুল সংখ্যক বাস্তুহারা বা রিফুজি আগমনের ফলেও প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কাজে অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্বেও উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয় তার ফলে ভারত বিভক্তির সঙ্গে সঙ্গে অজস্র মুসলমান পরিবার তাদের পৈতৃক ভিটেমাটি, বাড়িঘর ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসে। রিফুজি আগমনের চাপ পশ্চিম পাকিস্তানে বেশি পড়ে। ১৯৫১ সালের সেনসাস রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ৭২ লক্ষ রিফুজি ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তানে আগমন করে, তার মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে আসে ৬৫ লক্ষ। সেখানে প্রতি ৫ জন লোকের মধ্যে একজন ছিলেন রিফুজি। পাকিস্তানের আগত লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাত্ক্ষণিক ভাবে বাসস্থান ও খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং পুনর্বাসন নিশ্চিত করা নতুন সরকারের জন্য কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। উপরন্তু, যে প্রায় ৩৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান ছেড়ে ভারত গমন করেছিল তাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার এক কঠিন দায়িত্বও সরকারকে পালন করতে হয়।

এ সময় নতুন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থাও ভালো ছিল না। পাকিস্তানের অর্থনীতি ছিল কৃষিনির্ভর। এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ ছিল না। কলিকাতা, কিংবা দিল্লির মতো কোনো ব্যবসাকেন্দ্র, কিংবা শিল্প-কলকারখানাও পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে পায়নি। স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দেশত্যাগ এমন ত্বরিত ঘটে যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পদের ভাগ-বন্টনের বিষয়টি চাপা পড়ে যায়। উপরন্তু ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত কাশ্মির সংঘর্ষের সূত্র ধরে ভারত তার পূর্বপ্রতিশ্রুত এক হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাকিস্তানকে দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। পাকিস্তানের প্রাপ্য সামরিক ও বেসামরিক সরঞ্জামাদির অংশ দিতেও সে

অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

এমনি পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে সংহতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তা ছিল। পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য প্রয়োজন ছিল রক্তক্ষমতায় দুই অংশের জনগণের সমানুপাতিক অংশগ্রহণ। উভয় অংশের সমস্যার সমাধান সমান দৃষ্টিতে করা এবং উভয় অংশের উন্নয়ন প্রচেষ্টা হওয়া উচিত ছিল বৈষম্যহীনভাবে। শিক্ষা, চাকুরি, ব্যবসা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুই অংশের জনগণের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করার আবশ্যিকতা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা হয়নি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের দুই অংশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো

পাকিস্তান ছিল এক অস্বাভাবিক রাষ্ট্র। বিশাল ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম দুই প্রান্তে হাজার মাইলের ব্যবধানে দুই ভিন্ন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। জন্মলগ্নে এর পূর্ব অংশ 'পূর্ববাংলা' নামে অভিহিত হয়। ১৯৫৫ সালে এর নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে ৪টি প্রদেশ (পাঞ্জাব, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ) এবং ৫টি দেশীয় রাষ্ট্র (বেলুচিস্তান রাজ্য, ভাওয়ালপুর রাজ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ রাজ্য, খয়েরপুর রাজ্য ও জুনাগড় রাজ্য) এবং কিছু উপজাতি এলাকা ছিল। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমাংশের সবগুলো প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্য এক ইউনিটে এনে একটি প্রদেশ করে তার নামকরণ হয় পশ্চিম পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুই অংশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে কেবলমাত্র ধর্মীয় মিল ছাড়া ভাষা ও সংস্কৃতিগত আর কোনো মিল ছিল না। এর দুই অংশের আর্থসামাজিক কাঠামোতে ছিল ভারসাম্যের অভাব। পাকিস্তানের মোট ভূখণ্ডের শতকরা ৮৪.৩ ভাগ আয়তন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মাত্র ১৫.৭ ভাগ আয়তন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের, অথচ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৩.৭ ভাগ লোকের বাস ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং ৫৬.৩ ভাগ লোক ছিল পূর্ব পাকিস্তানের। পূর্ব পাকিস্তানে উচ্চবিত্তের অস্তিত্ব ছিল না। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলার উচ্চবিত্তরা ছিলেন জমিদারগোষ্ঠী-তাদের বাস ছিল কলিকাতায়। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর তারা ভারতে চলে যান এবং তাদের সম্পত্তি ভারতে স্থানান্তর করেন। উপরন্তু ১৯৫০ সালে পূর্ববাংলায় জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত করা হলে এখানকার মুসলমান জমিদারদের পতন ঘটে। এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৭ থেকেই 'পূর্ববাংলায় রাজনীতি ছিল মূলত মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে এবং গ্রামীণ জনসাধারণ ছিলেন তাদের সমর্থন ও সাফল্যের মূল ভিত্তি। অপরদিকে, পশ্চিম পাকিস্তানে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় সেখানে মধ্যবিত্তশ্রেণী ছিল প্রায় অনুপস্থিত। সেখানে নেতৃত্ব প্রায় পুরোপুরি সামন্তবাদী বড় জমিদারশ্রেণী দ্বারা গঠিত ছিল। পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় অধিক সমৃদ্ধ ছিল। 'পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় সেখানে ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত শিল্পকাঠামো, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের অবস্থান, বৃহৎ বন্দর এবং সমৃদ্ধ কয়েকটি শহর'। পক্ষান্তরে, পূর্ব পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা পায়নি। ব্রিটিশ আমলে পূর্ববাংলা

পাটচাষের জন্য বিখ্যাত থাকলেও সমস্ত পাটকল গড়ে ওঠে কলিকাতার আশেপাশে।

স্বাধীনতা লাভের সময় পাকিস্তান উত্তরাধিকার সূত্রে যে সেনাবাহিনী লাভ করে তাতে উচ্চপর্যায়ের বাঙালি অফিসার একজনও ছিলেন না। পাক সেনাবাহিনীর প্রায় পুরোটাই গঠিত ছিল পাঞ্জাবি, পাঠান ও বেলুচদের নিয়ে। পাক সিভিল সার্ভিসেও বাঙালি মুসলমান ছিল না বললেই চলে। পাকিস্তানের যাত্রালগ্নে এর সমগ্র আমলাতন্ত্র গঠিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী এবং ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের নিয়ে। এমনকি পূর্ববাংলার প্রশাসনে হিন্দুদের আধিক্য ছিল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি পেশাতেও হিন্দুরাই ছিল সংখ্যায় বেশি। সুতরাং দেশ বিভাগের পর পূর্ববাংলা থেকে বেশিরভাগ হিন্দু ডাক্তার, উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, বিভিন্ন অফিস-আদালতের কর্মকর্তা-কর্মচারী ভারতে গমন করলে এই প্রদেশে দক্ষ প্রশাসন ও পেশাজীবী শ্রেণীর অভাব দেখা যায়। পূর্ববাংলার প্রশাসনের শূন্যস্থান দখল করে ভারত থেকে আগত বাঙালি-অবাঙালি রিফুজিরা এবং পাঞ্জাবি আমলাবৃন্দ। এ প্রসঙ্গে খালিদ বিন সাইদ মন্তব্য করেছেন:

All the key positions in the West Bengal administration were held by either Punjabi civil servants or Urdu-speaking Muslim civil servants who had migrated from India.

ভারত থেকে পূর্ববাংলায় বিভিন্ন পর্যায়ের চাকুরিজীবী এলেও কোনো শিল্পপতি কিংবা ধনী ব্যবসায়ীশ্রেণী এখানে আসেননি। যে সকল মুসলমান রিফুজি ভারত থেকে মূলধন সঙ্গে এনেছিল তারা সকলেই পশ্চিম পাকিস্তানে আগমন করে। স্বভাবতই পাকিস্তানের জন্মলগ্নে পশ্চিম পাকিস্তান এক 'শক্তিশালী এলিটশ্রেণী সমৃদ্ধ মুহাজির, আমলাবর্গ এবং সেনাবাহিনী পায়'। এই সুবিধাবাদী শ্রেণীগোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়। আর তাই কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতাবন্টনে তাদের অনীহা শুরু থেকেই ছিল। বরং পূর্ববাংলাকে তাদের কাঁচামালের যোগানদার ও তৈরী পণ্য সামগ্রীর বাজার হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। ঐ উদ্দেশ্যে প্রণীত হয় দেশের অর্থনৈতিক নীতি। বাজেট প্রণয়নের লক্ষ্য হয় কর অব্যাহতি, লাইসেন্স-পারমিট বিতরণের ব্যবস্থা, পূর্ববাংলার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচারের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া 'বাজেট বরাদ্দের বাইরেও টালাওভাবে অর্থ ব্যয় করে পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদায়তন বাঁধ ও পানি প্রকল্প বাস্তবায়িত করা হতে থাকে'। তাছাড়া বৃহৎ সব শিল্প-কারখানা পশ্চিম পাকিস্তানে নির্মিত হওয়ায় উক্ত অঞ্চলের লোকেরাই সেখানে মজুর-শ্রমিক, কর্মচারী, কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি লাভ করে। পূর্ববাংলা থেকে হাজার মাইল দূরে যেয়ে সেখানে চাকুরি পাওয়া এবং পেলেও চাকুরি করা অসম্ভব ছিল। শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়েই নয়, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রচেষ্টার মাধ্যমেও পূর্ববাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়। উপরন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব চলে যায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতারা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। ভারত থেকে আগত মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন।

এমন কি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীও করাচিবাসী হন। ভারত থেকে আগত নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তান গণপরিষদে আসন দেয়া হয় পূর্ববাংলার কোটা থেকে এবং এইভাবে গণপরিষদেও পূর্ববাংলাকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়।

এইভাবে রাজনীতিতে, প্রশাসনে, সেনাবাহিনীতে, পুঁজিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকায় পাকিস্তানের যাত্রালগ্নে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ভারসাম্যের অভাব দেখা যায়।

কেন্দ্রে অবাঙালিদের নিয়ন্ত্রণ

পাকিস্তানের প্রশাসনিক ব্যবস্থায়, সামরিক ক্ষেত্রে, উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যয় বরাদ্দে, বৈদেশিক সাহায্য বন্টনে ইত্যাদি সর্ববিষয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ঔপনিবেশিক শাসন পুরোমাত্রায় চালু ছিল। তাছাড়া, বাঙালিদেরকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকেও বঞ্চিত রাখা হয়। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত তেইশ বছরে পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র একবার (১৯৪৭-৫১) পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধানের পদ লাভ করা সম্ভব হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মৃত্যুবরণ করলে (১৯৪৮) পূর্ব পাকিস্তান থেকে খাজা নাজিমউদ্দীন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গভর্নর জেনারেল হিসেবে দেশের সর্বময় ক্ষমতা ভোগ করলেও খাজা নাজিমউদ্দীনের সময় দেশের প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। আবার লিয়াকত আলী খান নিহত হওয়ার পর (১৯৫১) খাজা নাজিমউদ্দীন যখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (পাঞ্জাবি) হন সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, পূর্ব পাকিস্তানী খাজা নাজিমউদ্দীন গভর্নর জেনারেল হিসেবে যেমন প্রকৃত ক্ষমতা পাননি, আবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও তার হাতে প্রকৃত সরকারপ্রধানের ক্ষমতা আসেনি। এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তানী কারো হাতে (তা তিনি অবাঙালি পূর্ব পাকিস্তানী হন না কেন) ক্ষমতা না-দেওয়ার চক্রান্ত।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ৭ জন। তার মধ্যে ৪ জন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ৩ জন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে কেবল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালির স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বাকি দুজন (খাজা নাজিমউদ্দীন এবং বগুড়ার মোহাম্মদ আলী) পশ্চিম পাকিস্তানীদের স্বার্থরক্ষাকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ পর্যন্ত এই তেইশ বছরের মধ্যে মাত্র তেরো মাস (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬-অক্টোবর ১৯৫৭) পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ, তাও আবার পশ্চিম পাকিস্তানী দল পিাবলিকান পার্টির সঙ্গে কোয়ালিশন করে। এই স্বল্পতম সময়ে প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নেয়ার উদ্যোগ নিতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা কর্তৃক বরখাস্ত হয়ে ক্ষমতা হারান। পূর্ব পাকিস্তানী

অপর দুই প্রধানমন্ত্রীও বরখাস্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা পান। কাজী নাজিমুদ্দীনকে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বরখাস্ত করে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাকেও তিনি একবার বরখাস্ত করে পুনরায় প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এইভাবে দেখা যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বল্প সময়ের জন্য রাষ্ট্র ক্ষমতা পেয়েও সে-ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেননি।

আইয়ুবের সামরিক ও বেসামরিক শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানী যারা তার কেবিনেটে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তারা সকলেই ছিলেন discredited and rejected Muslim Leagues of the eastern wing'। এইভাবে দেখা যায় যে, বাঙালিদেরকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় পৌঁছাতে দেয়া হয়নি, কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি নির্ধারণে বাঙালিদের মতামতের কোনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি। প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত- তা রাজনৈতিক, প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক বা কূটনৈতিক যে-কোনো বিষয়েই হোক না কেন সর্বশেষ বিচারে এলিটদের দ্বারাই হত এবং এরা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক ও বেসামরিক অফিসারবৃন্দ।

এমনকি বাঙালিরা নিজ প্রদেশেও স্বশাসনের সুযোগ পায়নি। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদগুলো দখল করে রেখেছিল কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের অনুগত পশ্চিম পাকিস্তানীরা। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত এসব পশ্চিম পাকিস্তানী সামরিক বেসামরিক কর্মর্তারা বাঙালিদেরকে হয়ে প্রতিপন্ন করত। তারা বাঙালি মুসলমানদেরকে নিম্নবর্ণের হিন্দু থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান গণ্য করে তাদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখত এবং পারস্পরিক সামাজিক মেলামেশা করতো না। যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে বাঙালিদের সৃষ্টি হয় পারস্পরিক তিক্ততা এবং বিভেদের সম্পর্ক। স্বভাবতই বাঙালিদের মনে হতাশা, ক্ষোভ, অসন্তুষ্টি বাড়তে বাড়তে এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়।

ব্রিটিশ আমলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ঘোষণার মাধ্যমে ভারতের মুসলমানদেরকে আলাদা জাতি হিসেবে উপস্থাপন করে তাদের জন্য আলাদা আবাসভূমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। কিন্তু সেই তিনিই পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে বাঙালিদের স্বার্থ উপেক্ষা করার মাধ্যমে (যেমন বাংলাভাষাকে রাষ্ট্র ভাষার স্বীকৃতি না দেয়া) বাঙালি ও পশ্চিম পাকিস্তানীরা যে আলাদা জাতি- এমন ধারণা সৃষ্টির সূচনা করে দেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পাকিস্তানে সংসদীয় সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন না করে এক ব্যক্তির শাসন শুরু করেন। তিনি নিজ হাতে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং রাজনৈতিক দলের সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর উত্তরসূরীরা পরবর্তীকালে তাঁকে অনুসরণ করে ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। ফলে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে ব্যর্থ হয়। মোহাম্মদ আলী

জিল্লাহ, লিয়াকত আলী খান- তাঁদের জীবদ্দশায় পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়ন করে যেতে পারেননি। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়ন করতে সময় লেগেছে নয় বছর। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ এই এগারো বছর পাকিস্তানে তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বোপরি পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাওয়া প্রদানের ব্যাপারে আইন পরিষদ, কিংবা কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী কোনো কার্যকরী ভূমিকা পালন করেনি।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কাঠামো এবং সামরিক আমলাতন্ত্রের প্রভাব

পাকিস্তানের মতো বহু ভাষাভাষী এবং ভিন্ন সংস্কৃতির অধিকারী ও ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন নাগরিকদের মধ্যে জাতীয় ঐক্য এবং সংহতি সুদৃঢ় করতে হলে তাদের মধ্যে 'একজাতি-একরাষ্ট্র'- এই চেতনাবোধ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ছিল। তা সম্ভব ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক মমত্ববোধ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে একের সমস্যা অন্যের অনুধাবন করার মানসিকতা অর্জনের মাধ্যমে। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলাভের অব্যবহিত পরেই এর এক অংশ (অর্থাৎ পূর্ববাংলা) থেকে অভিযোগ উত্থাপিত হল যে তার উপর অন্য অংশ (অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তান) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের সূত্রপাত করেছে। ফলে নতুন রাষ্ট্রের যাত্রালাগেই সূচনা ঘটে এক অংশের প্রতি অন্য অংশের অবিশ্বাস ও সন্দেহের। ফলে পাকিস্তানের পূর্বাংশের জনগণের মধ্যে পাকিস্তানী জাতীতাবোধের চেয়ে বাঙালি জাতীয়তাবোধ বেশি গুরুত্ব লাভ করে। তাদের কাছে পাকিস্তান রাষ্ট্রের বৃহত্তর সমস্যার চেয়ে পূর্ববাংলার সমস্যা প্রাধান্য লাভ করে।

বাঙালিদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হওয়ার সঙ্গত কারণও ছিল। স্বাধীনতার পরপরই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলাভাষার প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় তাতে পূর্ববাংলা প্রদেশের জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন ধারণার জন্মলাভ করে যে তাদেরকে কখনই রাষ্ট্রীয় সমানাধিকার দেয়া হবে না। প্রথমে ভাষার প্রশ্নে বাঙালিরা অধিকার সচেতন হয়। ক্রমান্বয়ে প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যগুলি তাদেরকে ক্ষুব্ধ করে। একপর্যায়ে স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয়, যা ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সৃষ্টি বৈষম্যগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না।

পাকিস্তান ব্রিটিশদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এক সুশৃঙ্খল আমলাগোষ্ঠী লাভ করে। ব্রিটিশ আমলে আমলা গোষ্ঠীই ছিল প্রশাসনের সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল আমলাগোষ্ঠী। পাকিস্তান সৃষ্টির পর এর আমলাশ্রেণী প্রকৃত

ক্ষমতার অধিকারী হয়। কিন্তু এই আমলাগোষ্ঠীতে মুসলমানরা প্রাধান্য পাননি ছিল নগন্য। "The Pakistan bureaucracy at the time of independence had been a West Pakistan show". সে সময় (১৯৪৭) মুসলমান ICS অফিসারদের এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন পাঞ্জাবি, অবশিষ্টরা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ (বিশেষ করে যুক্তপ্রদেশ ও মাদ্রাজ) থেকে আগত অবাঙালি রিফুজি মুসলমান। এদের নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস। তারা পাকিস্তান প্রশাসনের উচ্চতম পদগুলো দখল করেন। স্বভাবতই স্বাধীনতার সূচনালগ্নেই পাকিস্তান প্রশাসনে অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম হয়। ১৯৪৭-এর পর ১৫ জন প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসের সদস্যকে পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে (পি.সি.সি) পদোন্নতি দেয়া হয়। উক্ত ১৫ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৪ জন। যে সময় সিভিল সার্ভিসে বাঙালিদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে বৈষম্য কমানো উচিত ছিল, তখন তা না করে কমসংখ্যক বাঙালিকে নিয়োগ কিংবা পদোন্নতি দিয়ে উল্টো বৈষম্য বৃদ্ধি করা হয়। তাছাড়া করাচীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করা হলে সেখানকার বিভিন্ন অফিস-আদালতে সৃষ্ট নতুন ছোট বড় পদে পশ্চিম পাকিস্তানীরাই একচেটিয়া চাকুরি লাভ করে। ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে তখন বাঙালিদের পক্ষে সেখানে যেয়ে ইন্টারভিউ দিয়ে চাকুরি লাভ সম্ভব ছিল না। ১৯৫৬ পর্যন্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা না দেয়ায় বাংলাভাষী বাঙালি ছাত্রদের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় টিকে থাকাও সম্ভব ছিল না। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে।

প্রশাসনে অবাঙালি মুসলমানদের একচেটিয়া আধিক্য রাষ্ট্রীয় নীতিমালা প্রণয়নে তাদেরকেই মুখ্য ভূমিকা পালনকারীতে পরিণত করে। পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তাদের স্বার্থ চিন্তা ছিল বিষায় পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায় অধিকার লাভ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপেক্ষিত হয়। ১৯৪৭ সালে যে ৯৪ জন অবাঙালি মুসলমান ICS অফিসার পাকিস্তানে এসেছিলেন ১৯৬৫ সালে তাদের মধ্যে ৪৭ জন কর্মরত ছিলেন। তাঁরা তখন ছিলেন বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার এবং দেশের সকল গুরুত্বপূর্ণ পদ তাঁদের দখলে ছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় অবাঙালিদের কতখানি আধিপত্য ছিল তা সারণী-১ থেকে প্রতীয়মান হবে।

পাকিস্তান সরকার ১৯৫০ সালের ৬ অক্টোবর এক আদেশ জারির মাধ্যমে সুপিরিয়র সার্ভিসসমূহ সহ পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসে কোটা পদ্ধতি প্রবর্তনের আদেশ জারি করেন। এই আদেশে নতুন চাকুরির ক্ষেত্রে মেধা যাচাইয়ের পাশাপাশি আঞ্চলিক কোটা সংরক্ষণকেও গুরুত্ব দেয়া হয়। কিন্তু এই আদেশ সত্ত্বেও প্রশাসনিক পদে বৈষম্য বাড়তেই থাকে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ৪২,০০০ কর্মচারী-কর্মকর্তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৯০০ এবং তারা অধিকাংশই ছিলেন নিম্নপদস্থ।

সারণী-১ : ১৯৬০ এর দশক পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থান

পদের নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১. সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
২. অর্থ এবং সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সকল সচিব (১৯৬৮ পর্যন্ত)	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৩. চেয়ারম্যান, ডেপুটি চেয়ারম্যানবৃন্দ পরিকল্পনা কর্মকমিশন	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৪. চেয়ারম্যানবৃন্দ : পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন ১৯৬২ পর্যন্ত	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৫. চেয়ারম্যান ও প্রশাসকবৃন্দ, পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৬. ১৯৬৭ পর্যন্ত পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের গভর্নরবৃন্দ	কেউ না	সকল পদ সবসময়
৭. পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রীবৃন্দ	কেউ না	সব সময়

উৎস : Safar A. Akanda, *East Pakistan and Politics of Regionalism*, unpublished Ph.D. Thesis. University of Denver. 1970 P.116. footnote-23.

১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব পর্যালোচনা করলে (সারণী-২ দ্রষ্টব্য) প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদসমূহে পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির পর প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। সামরিক শাসনের ৪৪ মাসে ৭৯০ জন জুনিয়র গ্রেড কর্মচারী নিয়োগ করা হয়, যার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল মাত্র ১২০ জন (১৫.২%)। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে ১৯৬০ সালের মে মাস পর্যন্ত ৯ মাসে ৭৩৪ জন সেকশন অফিসার নিয়োগ করা হয়, যার মাত্র ৭৪ জন (১০%) পূর্ব পাকিস্তানের। ১৯৫৯-১৯৬৩ সময়কালে রাওয়ালপিন্ডিতে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের ৩১৫ জন কেরানি নিয়োগ দেয়া হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানী ছিল মাত্র ৩৬ জন (১১%)। ১৯৬০ থেকে ১৯৬৩ সালের মধ্যে ১৪ জন সামরিক কর্মকর্তাকে, বেসামরিক প্রশাসনে নিয়োগ দেয়া হয়। তারা সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানী। আইয়ুবের ১৯৬২ সালের সংবিধানে যদিও বৈষম্য কমিয়ে এনে Parity সাম্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। যেমন ১৯৬৬ সালের কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গেজেটেড কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১,৩৩৮ এবং ৩,৭০৮ জন এবং একই বছরের নন-গেজেটেড কর্মচারীর সংখ্যা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল যথাক্রমে ২৬,৩১০ এবং ৮২,৯৪৪ জন।

সারণী-২ : ১৯৫৫ এবং ১৯৬৮ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সার্ভিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব

পদ	১৯৫৫ সালে			১৯৫৫ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার	১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানী	পূর্ব পাকিস্তানী		
সেক্রেটারি	১৯	১৯	×	০.০	১৪.০
জয়েন্ট সেক্রেটারি	৪১	৩৮	৩	৭.৩	৬.০
ডেপুটি সেক্রেটারি	১৩৩	১২৩	১০	৭.৫	১৮.০
আভার সেক্রেটারি	৫৪৮	৫১০	৩৮	৭.০	২০.০
অন্যান্য	-	-	-	-	-
মোট	৭৪১	৬৯০	৫১	৬.৯	?

উৎস : Safar A. Akanda *op.cit*, P. 121; Verninder Grover (ed.) *Encyclopaedia of SAARC Nations*, New Delhi. 1997

কেবল সিভিল সার্ভিসেই নয়, ফরেন সার্ভিস, বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত ও আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য বিরাজমান ছিল। (সারণী-৩ দ্রষ্টব্য)।

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা সার্ভিসেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক বৈষম্য বিরাজ করে। দেশভাগের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা ছিল নগন্য। ব্রিটিশ আমলে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বাঙালিদেরকে অসামরিক জাতি বলে বিবেচনা করত, ফলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে বাঙালিদেরকে খুব কম সংখ্যক নিয়োগ দেয়া হত। স্বাধীনতার পর এ অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি। স্বাধীনতার পরবর্তী চার বছর পূর্ব পাকিস্তান থেকে মাত্র ৮১০ জনকে প্রতিরক্ষা বিভাগে নিয়োগ করা হয়। প্রতিরক্ষা সার্ভিসে আসার জন্য পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে উৎসাহিত করা হয়নি। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল শাখার সদর দফতর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিরক্ষা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলিও ছিল সেখানে। প্রতিরক্ষা বিভাগে নাম লেখালেই চলে যেতে হত পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৬ থেকে ২০ বা ২২ বছর বয়সে প্রতিরক্ষা বিভাগে চাকুরি নিয়ে নিজ মাতৃভূমি ছেড়ে হাজার মাইল দূরে যাওয়ার আগ্রহ খুব কম পূর্ব পাকিস্তানীর ছিল। অভিভাবকরাও তাদের সন্তানদের অতদূরে চাকুরি নিয়ে যেতে দিতে চাইতেন না। আবার ইচ্ছে থাকলেও প্রতিরক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ লাভ বাঙালিদের জন্য ছিল বেশ কঠিন। রিট্রুটিং বোর্ডগুলি গঠিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানীদের নিয়ে। তারা সহসা বাঙালিদের অফিসার পদে নিয়োগ দিতো না। এমনকি জোয়ান পদে নিয়োগের জন্য যে দৈহিক মাপ ও গঠন নির্ধারণ করা হয়েছিল তা খুব কম বাঙালির ছিল। স্বভাবতই প্রতিরক্ষা সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য বাড়তে বাড়তে হয় আকাশছোঁয়া। (সারণী-৪ দ্রষ্টব্য)।

চাকুরির ক্ষেত্র	সাল	মোট সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা
ফরেন সার্ভিস ক্যাডার	১৯৫৩	১১৯	৩৬	৮৩	৩১%
	১৯৬২	২৪০	৫০	১৯০	২০.৮%
স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান	১৯৫০	২০৬	৪১	১৬৫	১৯.৯%
	১৯৬৩	৭৫১	২৩৬	৫১৫	৩১.৪%

উৎস : Safar A. Akanda. *op.cit* P.141, Table-XV. P. 142. Table-XVI

সারণী-৪ : ১৯৫৬ সালে প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন পদে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী
অফিসারের সংখ্যা ও হার

পদবি	পশ্চিম পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানী অফিসারের সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানীদের শতকরা হার
লে. জেনারেল	৩	০	০.০০
মেজর জেনারেল	২০	০	০.০০
ব্রিগেডিয়ার	৩৪	১	২.৮৫
কর্নেল	৪৯	২	২.০০
লে. কর্নেল	১৯৮	২	১.৩৩
মেজর	৫৯০	১০	১.৬৬
সেনাবাহিনীতে মোট	৮৯৪	১৪	১.৫৬
নেভিতে মোট	৫৯৩	৭	১.১৬
বিমানবাহিনীতে মোট	৬৪০	৬০	৮.৫৭

উৎস : Verninder Grover, *op.cit* 20-21. Table-3. Table-4

পরবর্তী বছরগুলোতে এই বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৮ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের মধ্যে অনুপাত ছিল জোয়ানদের ক্ষেত্রে ১ : ২৫ এবং অফিসারের ক্ষেত্রে ১:৯০।

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য

সারণী-৫ এ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির একটা তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যায়। সারণীতে লক্ষণীয় যে, ১৯৪৭ সালে প্রাইমারী থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানে বেশি ছিল। কিন্তু পরবর্তী ২০ বছরে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ পর্যন্ত সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে স্কুলগামী

ছেলে-মেয়ের সংখ্যা বাড়লেও প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা কমেছে। অর্থাৎ একই সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা প্রায় ৪ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণী-৫ : ১৯৪৭-৪৮ থেকে ১৯৬৮-৬৯ সময়কালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষার অগ্রগতি

প্রতিষ্ঠান	পশ্চিম পাকিস্তান			পূর্ব পাকিস্তান		
প্রাইমারী স্কুল	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি	১৯৪৭-৪৮	১৯৬৮-৬৯	বৃদ্ধি
	৮,৪১৩	৩৯,৪১৮	+৩৬৯%	২৯৬৬৩	২৮,৩০৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্মুখে ১৪৫৫টি কমেছে। (-৪.৬%)
সেকেন্ডারি স্কুল	২৫৯৮	৪৪৭২	+১৭৬%	৩৪৮১	৩৯৬৪	+১১.৪%
বিভিন্ন শ্রেণীর কলেজ	৪০	২৭১	+৬৭৫%	৫০	১৬২	+৩২%
মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও কৃষি কলেজ	৪	১৭	+৪২৫%	৩	৯	+৩০০%
বিশ্ববিদ্যালয়	২	৬		১	৪	
	(৬৫৪ জন শিক্ষার্থী)	(১৮২০ জন জন শিক্ষার্থী)		(১৬২০ জন শিক্ষার্থী)	(৮,৮৩) জন শিক্ষার্থী)	

উৎস : Bangladesh Documents, P.19.

অতএব দেখা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানী শিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সেখানে বিদ্যায়তনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলেও পূর্ব পাকিস্তানের শিশুদেরকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এইভাবে শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরকে এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষা বাবদ অর্থবরাদ্দের ক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৫৫ সময়কালে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে যেখানে বরাদ্দ দেয়া হয় ১৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা। (১৩.৫% মাত্র)। অপর আরেক তথ্য অনুযায়ী ১৯৫১-১৯৬১ সময়ে শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৫.৬৩ টাকা। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য তা ৮.৬৩ টাকা (অর্থাৎ ব্যবধান ৫৩%-এরও বেশি ছিল)। তাছাড়া Colombo Plan, Ford Foundation, Commonwealth Aid- প্রভৃতি প্রোগ্রামের আওতায় যে সকল বৈদেশিক বৃত্তি দেয়া হয় তার সুযোগ-সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করে, পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য প্রার্থীরা অনেক সময় এসব বৃত্তির সন্ধানই পেত না। এইভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে পূর্ব পাকিস্তানীরা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে নিয়োগের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হতে থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানীদের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক শোষণ করা। পাকিস্তান আমলে ব্রিটেন, আমেরিকার অনেক নিরপেক্ষ অর্থনীতিবিদ বলেছেন যে, “The economic development of East Pakistan was sadly neglected and that something ought to be done about it.”

পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মাথাপিছু আয় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালেই স্পষ্ট হয় এবং তা পরবর্তী বছরগুলোতে ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় থেকেই পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের চেয়ে অধিকমাত্রায় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। ফলে দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের মধ্যে বৈষম্যও বাড়তে থাকে। ১৯৪৮-৪৯ আর্থিক বছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের ৫৭.৫৯ ভাগ অর্জিত হয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত চা, চামড়া, রেশম প্রভৃতি থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। এই প্রদেশের বনজ সম্পদ—যেমন বাঁশ ও কাঠ—কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট তৈরিতে অবদান রাখে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানের উভয় অংশ শিল্প কারখানার দিকে প্রায় সমান অবস্থায় ছিল (সারণী-৬ দ্রষ্টব্য) পশ্চিম পাকিস্তান পশম, সিমেন্ট, চিনি শিল্প এবং যোগাযোগ অবকাঠামো ক্ষেত্রে অগ্রসর থাকলেও পূর্ব পাকিস্তান পাট, চা, চামড়া, সুতাকল, রেশম, তামাক প্রভৃতি

সারণী-৬ : ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কারখানা

শিল্প	অবিভক্ত ভারতে সংখ্যা	পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পূর্ব পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত
পাটকল	১১৪	×	×	×
তুলা কল	৪০৫	১৬	১০	৪
চিনি কল	১৫১	৯	৫	৪
সিমেন্ট কারখানা	১৩	৫	১	৪
ম্যাচ ফ্যাক্টরি	৭	৮	৪	৪
মোট		৩৮	২০	১৮

উৎস : Safar A. Akanda, *op.cit*, p. 171. Table XCCII.

ক্ষেত্রে সমৃদ্ধতর ছিল। পূর্ব পাকিস্তানের জমি ছিল তুলনামূলকভাবে অধিক উর্বর। ১৯৪৭-৪৮ সালে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক ভারসাম্য বজায় ছিল, পরবর্তী বছরগুলোতে তা অসমান হওয়ার কারণ হল শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থান্বেষী অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ। এই বৈষম্য সৃষ্টির মূল কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. পশ্চিম পাকিস্তানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অধিক আর্থিক বিনিয়োগ;
২. পাকিস্তানের রাজধানী ও প্রতিরক্ষা সার্ভিসের সকল সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা করা
৩. পূর্ব পাকিস্তান থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে স্থানান্তর;
৪. ব্যাংকিং এবং ঋণদান প্রতিষ্ঠানসমূহের সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বিত্তশালী রিফুজিরা পশ্চিম পাকিস্তানে গমন করেন। ভাষা ও সাংস্কৃতিক নৈকট্যের কারণে এবং ফেডারেল রাজধানী অবস্থিত হওয়ায় বোম্বে

ও উত্তর প্রদেশের মুসলমান ব্যবসায়ী-শিল্পপতিবৃন্দ **Android Coding Bd** এবং সেখানে তাদের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড শুরু করেন। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানে ভিন্ন চিত্র লক্ষ্য করা যায়। সেখান থেকে হিন্দু মহাজন ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তাদের পুঁজিপাট্টা নিয়ে ভারতে চলে যায়। পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের পুঁজিপতি হিন্দুদের ভারতগমনে বাধা দেননি, আবার ভারত থেকে আগত মুসলমান পুঁজিপতিদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে গমন করতেও উদ্বুদ্ধ করেননি। বরং পশ্চিম পাকিস্তানে আগত রিফুজি শিল্পপতি-ব্যবসায়ী শ্রেণীকে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানসহ অবাধ আমদানি-রফতানি লাইসেন্স প্রদান করা হয়। ফলে বৈদেশিক বাণিজ্য তাদের দখলে চলে যায় এবং অল্পসময়ে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করে। পাট এবং তুলা রফতানির একচেটিয়া অধিকারও পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ীদের হাতে চলে যায়। এইভাবে অর্জিত বিপুল মুনাফা তারা ১৯৫০ সাল নাগাদ টেক্সটাইল শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করে। স্বাধীনতার পর পর ফেডারেল রাজধানী প্রতিষ্ঠা করতে এবং প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল সদর দফতর নির্মাণে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থব্যয় করা হয় তার সুফল একচেটিয়া পশ্চিম পাকিস্তানীরা ভোগ করে। পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পের প্রসার ঘটানোর জন্য রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিদ্যুৎ এবং সেচ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। এইভাবে স্বাধীনতার ২/৩ বছরের মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক উন্নতি ঘটে।

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যে অর্থব্যয় করেন তার প্রায় ৯০% ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে (সারণী-৭)। উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় হয় ১৬৮১ মিলিয়ন টাকা। কিন্তু এই অর্থের মধ্যে মাত্র ৪২৭ মিলিয়ন টাকা সেখানে ব্যয় করা হয়।

সারণী- ৭ : ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ

ব্যয়ের খাত	পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের শতকরা হার
আর্থিক সাহায্য	১০,০০০	১,২৬০	১১.২
মূলধন ব্যয়	২,১০০	৬২০	২২.৮
অনুদান	৫৪০	১৮০	২৫.০
শিক্ষাখাত	১,৫৩০	২৪০	১৩.৩
বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ	৭৩০	১৫০	১৭.০
প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	৪,৬৫০	১০০	২.১
মোট	১৯,৫৫০	২,৫৫০	১০.২

উৎস : Safar A. Akanda, *op.cit.*, p.176 Table XXIII.

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে প্রদেশদ্বয়ের উন্নয়ন খরচ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, উক্ত সময় পূর্ব পাকিস্তান সরকার যেখানে মাত্র ৫১৪.৭ মিলিয়ন টাকা উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে, সেই একই সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার উন্নয়ন খাতে খরচ করেছে

এইভাবে দেখা যায় যে, ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে দুই প্রদেশের মধ্যে ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হয়। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য ১৯৫১-৫২ সালে যেখানে ছিল ১৮%, ১৯৫৪-৫৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৪%।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৫৫-৫৯) উন্নয়ন বৈষম্য

পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হয় জুলাই ১৯৫৫ সালে। এতে দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কমিয়ে আনার প্রতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে এই পরিকল্পনা বৈষম্য বৃদ্ধির সহায়ক হয়। পরিকল্পনা মেয়াদকালে পশ্চিম পাকিস্তানে পাবলিক সেক্টরে যেখানে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৪,৯৬৪ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৯৮৩ মিলিয়ন টাকা (মোট ব্যয়ের মাত্র ১৬.৫%)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল্যায়ন বিশ্লেষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ খরচ করেও সেখানে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ দেয়া হত, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সম্পূর্ণ খরচ করা সম্ভব হত না। The Economic Survey of East Pakistan. 1964-65 থেকে জানা যায় যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানে যে প্রকল্প পরিকল্পনা ছিল তার মাত্র ৩৭% অর্জিত হয়েছিল, অথচ পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জন ছিল ১০০%। উক্ত সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে মাথাপিছু বিনিয়োগ যেখানে ছিল ২০৫ টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানে এই পরিমাণ ছিল মাথাপিছু মাত্র ৮০ টাকা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাথাপিছু আয় ৫% বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্ষেত্রে মাথাপিছু ১% কমে যায়। ফলে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য ১৯৫৪-৫৫ সালের ২৪% থেকে বেড়ে ১৯৫৯-৬০ সালে ২৯% হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৬০-৬৫) বৈষম্য

এই পরিকল্পনাতেও দুই প্রদেশের অর্থনৈতিক বৈষম্য কমিয়ে আনার আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও কীভাবে তা অর্জন করা হবে সে বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি। বরং বিনিয়োগের হার পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বেশি ধার্য করা হয় (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মাথাপিছু যথাক্রমে ১৯০ ও ২৯২ টাকা)। মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে দুই প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য বেড়ে ৪৪% এ দাঁড়ায়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বৈষম্য

দুই প্রদেশের মধ্যে বিরাজমান বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এই পরিকল্পনায় কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জন্য উন্নয়ন বরাদ্দ ধার্য করা হয় ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ২৫,০০০ মিলিয়ন টাকা। পাবলিক সেক্টরে বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল পূর্ব পাকিস্তানের ১৬,০০০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৪,০০০ মিলিয়ন টাকা। কাগজে কলমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ বেশি দেখানো হলেও, কারচুপি করে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বিশাল পরিমাণ অর্থ অতিরিক্ত বরাদ্দ রাখা হয়। যেমন Indus Basin Development Works-এর জন্য ২য়

ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রকৃত বরাদ্দের চেয়ে ~~আরও~~ ^{Android Coding Bot} বেশি টাকা খরচ করা হয়। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতা দূরীকরণে প্রকল্পের নামে ২য় ও ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বরাদ্দের বাইরে ৫,৯০০ মিলিয়ন টাকা খরচ করা হয়। অপরপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ খাতে (যা এই প্রদেশের জন্য অতি জরুরি ছিল) কোনো অতিরিক্ত বরাদ্দ দেয়া হয়নি।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ২৭,০০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ দেয়া হলেও বাস্তবে খরচ করা হয় ১০,৯৭০ মিলিয়ন টাকা। অর্থাৎ মোট বরাদ্দের প্রকৃত খরচের পরিমাণ ছিল পাবলিক সেক্টরে ৪৩% এবং প্রাইভেট সেক্টরে ৩৫% মাত্র। ফলে কেবল তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে ২৩% বৈষম্য বৃদ্ধি পায়।

পাকিস্তানের রাজধানী এবং সকল সামরিক ও বেসামরিক বিভাগসমূহের হেড অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় সেগুলোর ভবন নির্মাণ, আসবাবপত্র ক্রয়, স্টাফদের বাসাবাড়ি নির্মাণ প্রভৃতিতে যে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা হয় এবং বিভিন্ন নির্মাণ ও সরবরাহ কাজে যে কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি হয় তার একচেটিয়া সুযোগ লাভ করে পশ্চিম পাকিস্তানীরা। কেবল করাচীকে রাজধানী শহর হিসেবে গড়ে তুলতেই ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত ব্যয় হয় ৫,৭০০ মিলিয়ন টাকা। এই অর্থ ছিল উক্ত সময়ে পাকিস্তান সরকারের মোট ব্যয়ের ৫৬.৪% যে সময় পূর্ব পাকিস্তানে মোট সরকারি ব্যয়ের হার ছিল মাত্র ৫.১০%।

১৯৬১ সালে সামরিক সরকার প্রথমে রাওয়ালপিণ্ডিতে এবং পরে ইসলামাবাদে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পূর্ব পাকিস্তানীদেরকে খুশি করার জন্য আইয়ুব খান ঢাকায় দ্বিতীয় রাজধানী প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেন। কিন্তু ১৯৬৭ সাল নাগাদ ইসলামাবাদের উন্নয়নে যেখানে ৩,০০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয়, সেখানে ঢাকার উন্নয়নে ব্যয় হয় মাত্র ২৫০ মিলিয়ন টাকা।

এইভাবে রাজধানী শহর নির্মাণের নামে পশ্চিম পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়।

সেনা, নৌ এবং বিমানবাহিনীর সদর দফতর পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত হওয়ায় প্রতিরক্ষাখাতে যে ব্যয় বরাদ্দ (রাজস্ব বাজেটের প্রায় ৬০%) তা প্রায় পুরোটাই ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৪৭-৫৬ সময়কালে প্রতিরক্ষা খাতে মোট ব্যয় ছিল ৪৫৬৫.৭ মিলিয়ন টাকা। এর মধ্যে মাত্র ১৬৭.২ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয় পূর্ব পাকিস্তানে। একই সময় পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত প্রতিরক্ষা সদর দফতরগুলি প্রশাসনিক খরচ ছিল ২,৫৬৩.৯ মিলিয়ন টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে এই খাতে কোনো বরাদ্দ ছিল না।

পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পদ পাচার

পাকিস্তানের দুই অংশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত সময়কালে যেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল ৪৯২৪.১ মিলিয়ন টাকা, সেখানে পশ্চিম পাকিস্তানে ঘাটতি ছিল ১৬,৬৩৪.৬ মিলিয়ন টাকা। স্বভাবতই পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বাণিজ্য-ঘাটতি পূরণ করা হয়। ১৯৪৭-৬৬ সময়ে পাকিস্তানের মোট রফতানিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ ছিল ৪২%, অথচ মোট আমদানিতে তার অংশ ছিল ৬৯%।

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রফতানি খাতে অবদান ৩১%। পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল পাট রফতানি। কিন্তু পাট রফতানি করে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হয় তা ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে। আবার দুই অঞ্চলের মধ্যে যে আন্তঃপ্রাদেশিক বাণিজ্য হয় তাতেও পূর্ব পাকিস্তান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি রফতানি হলেও, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রফতানি হয় কম। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জাহাজভর্তি পণ্য এনে পূর্ব পাকিস্তানে চড়া দামে বিক্রি করা হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে কোনো পণ্য না নিয়ে জাহাজগুলি খালি অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরিয়ে নেয়া হতো।

ব্যাংকিং সেক্টরেও পূর্ব পাকিস্তান অবহেলিত থাকে। ১৯৬৩ সালে তফসিলি ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ৩৬, যার মোট ১১৩০টি শাখার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৩৬২টি (৩২%)। স্বভাবত ব্যাংকিং খাতের সেবা পশ্চিম পাকিস্তানীরাই বেশি লাভ করে। ব্যাংকিং সেক্টরের মাধ্যমে যে বিনিয়োগ করা হয় তার ৯০ ভাগ পায় পশ্চিম পাকিস্তান।

অবশেষে তেইশ বছরের শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার সহ্য করার পর বাঙালিরা ১৯৭০-এর নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা লাভ করতে ব্যর্থ হলে তারা বাধ্য হয় স্বাধীনতার চিন্তা করতে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীরাই বাঙালিদেরকে বাধ্য করে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করতে। যদিও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও সমঝোতার ভিত্তিতে, কিন্তু বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জন করতে হয় সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।

সহায়ক গ্রন্থ

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র, প্রথম খণ্ড, পটভূমি, ১৯০৫-১৯৫৮, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, প্রশাসনের অন্দরমহল : বাংলাদেশ, ঢাকা. ২০১২।

মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত কুমার রায়, বাংলাদেশ সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ), ঢাকা. ২০১৩।

Khalid Bin Sayeed, *The Political system of Pakistan*, Karachi, 1967.

Rounaq Jahan, *Pakistan : Failure in National Integration*, London. 1972.